উঠেছিল। মন্দিরের বাইরে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা হত এবং আপামর জনসাধারণ যাতে তা শুনতে পারে, সেই জন্য চাতাল তৈরি করা হয়েছিল। মন্দিরের অভ্যন্তরে দেবদেবীর মূর্তি ছাড়া, সন্তদের মূর্তি স্থান পেয়েছিল। তৎকালীন সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবনে মন্দিরই ছিল প্রাণশক্তির আধার। এবং সেই শক্তিকে অক্ষুন্ন রাখতে হলে, এই পরিবর্তন ছিল অবশ্যম্ভাবী। পল্লব ও চোল আমলের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য তাই মন্দিরকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল।

পল্লব স্থাপত্য

দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ইতিহাস পল্লব আমলে মন্দির-সমূহ থেকে শুরু হয়েছে। এই মন্দিরগুলিতে আমরা সর্বপ্রথম দ্রাবিড় শিল্প-রীতির সাক্ষাৎ পাই। শিল্প শাস্ত্রে দ্রাবিড় প্রাসাদের উপরিভাগকে, কখনও বা সমগ্র প্রাসাদকে, অষ্টভুজ অথবা ষড়ভুজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই বর্ণনা অস্পষ্ট এবং দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলির সঙ্গে সর্বদা এই বর্ণনার মিল পাওয়া যায় না।

প্রথমে দ্রাবিড় মন্দিরগুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা যায়। বিমানের পিরামিডের মত উচ্চতা এই মন্দিরের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বিমান বহুতল। প্রতিটি তল গর্ভগৃহের প্রতিরূপ এবং নিচের তলের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। এর শীর্ষদেশ গম্বুজাকৃতি, শিল্পশাস্ত্রে যাকে স্তূপ অথবা স্তূপিকা বলা হয়। পরবর্তী কালের মন্দিরগুলিতে এই তলগুলি এত ঘনসন্নিবিষ্ট, এবং সেগুলিতে আনুষঙ্গিকের বাহুল্য এত বেশি যে, এই তলগুলিকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায় না। এই মন্দিরের অভ্যন্তরে থাকে একটি চতুষ্কোণ গর্ভগৃহ এবং একে ঘিরে থাকে একটি বৃহত্তর চতুষ্কোণ আচ্ছাদিত বেষ্টনী, যাকে 'প্রদক্ষিণ' বলা হয়। মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে, আয়তাকার স্তম্ভ দ্বারা কতকগুলি কুলুঙ্গী তৈরি করা হয়। চৈত্য-বাতায়নসহ উত্তল বেলনাকার কার্নিস এবং উপরের তলগুলিকে ঘিরে অপরিসর অলিন্দ, এই মন্দিরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পরবর্তী কালে এই মন্দিরগুলিতে স্তম্ভযুক্ত হলঘর, বিভিন্ন অংশের সংগে সংযোগ স্থাপক পথ এবং বৃহদাকার গোপুরমগুলি (তোরণ) নির্মিত হয়েছিল।

পল্লব আমলে মন্দিরগুলি যাঁরা নির্মাণ করেছিলেন, শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁরা একেবারে নবীন আগন্তুক ছিলেন না। তাঁদের পিছনে নিশ্চয়ই বংশপরম্পরায় বহু যুগের শিল্পসাধনা এবং ঐতিহ্য কাজ করেছিল। তবে পূর্ববর্তী এই শিল্পীরা শিল্পের উপাদান হিসাবে কাঠ এবং অন্যান্য বিনাশশীল দ্রব্য ব্যবহার করেছিলেন বলে সেগুলি পাওয়া যায় নি। কিন্তু এই মন্দিরগুলির প্রাথমিক-

পর্যায়ে দারু শিল্পের চিহ্ন পাওয়া গেছে। শিল্প রীতির দিক থেকেও এই মন্দিরগুলিকে আকস্মিক সৃষ্টি বলা যায় না। এগুলিকে গুপ্ত যুগের তল-বিশিষ্ট মন্দিরের অভিযোজন বলা যায়। অবশ্য এই অভিযোজনের সময় শিল্পীগণ মন্দিরগুলিতে পূর্ববর্ণিত কিছু নতুন অংশ যোগ করেছিলেন। এই অংশগুলিই এই মন্দিরসমূহের স্থানীয় বৈশিষ্ট্য।

পল্লব যুগের একদিকে পাহাড়-কাটা মন্দির এবং অন্য দিকে স্বাধীন, স্বতন্ত্র মন্দির। বলা যায় এই যুগে উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। পল্লব শিল্পীগণ ধীরে ধীরে দারুশিল্প এবং গুহাস্থাপত্যের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন। পল্লব যুগের প্রথম পর্বের স্থাপত্য নিদর্শনগুলি সবই পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছিল। এই নিদর্শনগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম শ্রেণীতে আমরা প্রথম মহেন্দ্র বর্মণের রাজত্বকালে নির্মিত সাধারণ স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপগুলিকে স্থান দিতে পারি। অনেকাংশে অনুরূপ, কিন্তু ব্যাপকতর মণ্ডপ এবং একশিলা মন্দিরসমূহ, যেগুলিকে রথ বলা হয়, দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হতে পারে। এগুলি প্রথম নরসিংহ বর্মণ মহামল্ল এবং তাঁর অব্যবহিত পরবর্তী শাসকদের সময় নির্মিত হয়েছিল।

প্রথম মহেন্দ্র বর্মণের রাজত্ব কালে নির্মিত সবগুলি পাহাড়-কাটা মন্দিরই যে এক ধরনেও ছিল, এমন নয়। তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে তৈরি মন্দির-গুলির সঙ্গে শেষ দিকে তৈরি উণ্ডবল্লির (গুন্টুর জেলা) অনন্তশায়ন মন্দির এবং ভৈরবকোণ্ডের (উত্তর আর্কট জেলা) মন্দিরগুলির তুলনা করলে কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য চোখে পড়ে। পূর্বতন মন্দিরগুলি সহজ সরল। অনন্তশায়ন মন্দিরটি কিন্তু ঠিক তা নয়। মনে হয় এটি বৌদ্ধ বিহারের অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ দ্বারা নির্মিত চারতলা এই মন্দিরের উচ্চতা ৫০ ফুট। ভৈরবকোণ্ডের মন্দিরের ব্যাপকাকার এবং অলংকৃত স্তম্ভগুলিতে নিশ্চিত-ভাবে পল্লব যুগের শিল্প বৈশিষ্ট্যের সূচনা চোখে পড়ে। এই স্তম্ভগুলির নিম্নভাগে এবং শীর্ষদেশে সর্বপ্রথম সিংহ মূর্তি যোগ করা হয়। এই স্তম্ভ-গুলি পরে আরও পরিশীলিত হয়ে, মহামল্ল গোষ্ঠীর মন্দিরগুলিতে উজ্জ্বল শিল্প নিদর্শনরূপে বিবেচিত হয়।

মহামল্ল গোষ্ঠীর রাজাদের সময়ের স্থাপত্য নিদর্শন সবগুলি মাদ্রাজের ত্রিশ মাইল দক্ষিণে, সমুদ্র তীরে, মামল্লপুরমে (মহাবলিপুরম) পাওয়া গেছে। এখানে প্রাপ্ত মণ্ডপ দশটি এবং রথ আটটি। মহেন্দ্র বর্মণের মণ্ডপগুলির তুলনায়, এই মণ্ডপগুলি অপেক্ষাকৃত উন্নত, তবে তাদের আয়তন এবং সাধারণ চরিত্র মোটামুটি একই রকমের। কোন রথই আয়তনে খুব বড় নয়। সর্ব বৃহৎ রথটির দৈর্ঘ্য ৪২ ফুট, প্রস্থ ৩৫ ফুট এবং উচ্চতা ৪০ ফুট। রথগুলিকে

সাধারণত 'সপ্ত প্যাগোডা' বলা হয়। এ গুলির শিল্পরীতি অনেকটা মণ্ডপগুলির মত, তবে তাদের মধ্যে পূর্বতন দারুশিল্পের চিহ্ন অতিশয় স্পষ্ট। এই রথগুলির অভ্যন্তর ভাগ অসম্পূর্ণ, তাই মনে হয় এগুলি কখনও ব্যবহার করা হয়নি। এই রথগুলির কয়েকটির সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডব এবং দ্রৌপদীর নাম জড়িত। কয়েকটি রথকে বিহার অথবা চৈত্যের অনুলিপি বলে মনে হয়। আরও নির্দিষ্ট ভাবে বলা যায় যে, ভীম, সহদেব এবং গণেশের নামাঙ্কিত রথগুলি চৈত্য ধরনের। সম্ভবত মামল্লপুরমের সবগুলি রথই শৈব ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

এই রথগুলির মধ্য দিয়ে পল্লব স্থাপত্যের এক অধ্যায় শেষ হয়ে আর এক অধ্যায় আরম্ভ হয়। এই নতুন অধ্যায়ের মন্দিরগুলি আর আগের মত পাহাড়ে উৎকীর্ণ নয়, সেগুলি স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র। এই অধ্যায়ের মন্দিরগুলিকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম শ্রেণীর মন্দিরগুলি রাজসিংহ গোষ্ঠীর রাজত্ব কালে (৭০০-৮০০ খৃষ্টাব্দ) নির্মিত হয়েছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্দিরগুলির নির্মাণ কাল নন্দিবর্মণ গোষ্ঠীর রাজত্ব (৮০০-৯০০ খৃষ্টাব্দ)। প্রথম শ্রেণীর মন্দিরের সংখ্যা ছয়। এদের মধ্যে তিনটি, তীর মন্দির, ঈশ্বর মন্দির এবং মুকুন্দ মন্দির আছে মামল্লপুরমে। একটি মন্দির আছে দক্ষিণ আর্কটের পনমলইয়ে। অন্য দুইটি মন্দির হল কাঞ্চীপুরমের কৈলাসনাথ মন্দির এবং বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দির। দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্দিরগুলি আয়তনে ছোট। এগুলিতে পূর্ব যুগের তুলনায় কোন অগ্রগতির লক্ষণ পাওয়া যায় না। এই মন্দিরগুলিতে পল্লবদের অবনতির চিহ্ন সুপরিস্ফুট। এদের মধ্যে কাঞ্চীপুরমের মুক্তেশ্বর এবং মতঙ্গেশ্বর মন্দির উল্লেখযোগ্য।

পল্লবগণ এই মন্দিরগুলির মধ্য দিয়ে অমরাবতীর শিল্প ঐতিহ্যকে লালন এবং বর্ধন করেছিলেন। কালক্রমে পল্লব শিল্প ঐতিহ্য ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন ইত্যাদি হিন্দু উপনিবেশ সমূহের স্থাপত্যকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল।

রাজসিংহ গোষ্ঠীর মন্দিরগুলির মধ্যে মামল্লপুরমের তীর মন্দির এবং কাঞ্চীপুরমের কৈলাসনাথ এবং বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দির স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার যোগ্য। পাহাড়ে উৎকীর্ণ না হয়ে স্বতন্ত্র ভাবে নির্মিত হওয়ায় এই মন্দিরগুলিতে শিল্পীর স্বাধীনতা বেশি ছিল।

এই মন্দিরগুলির মধ্যে মামল্লপুরমের মন্দির প্রাচীনতম। একেবারে সমুদ্রের উপরে অবস্থিত হওয়ায় একে তীর মন্দির বলা হয়। বৃহৎ প্রাচীর বেষ্টিত চতুর্ভুজাকার প্রাঙ্গনে মন্দিরটি অবস্থিত। এ থেকে মনে হয় যে মন্দিরটি যখন নির্মিত হয়েছিল, দক্ষিণ ভারতে মন্দির পরিকল্পনা তখন নির্দিষ্ট রূপ নিয়ে ছিল। এই পরিকল্পনার মূল বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে পাশাপাশি দুইটি মন্দির অসমঞ্জস ভাবে সংলগ্ন হয়ে আছে। প্রতিটি মন্দিরের একটি নিজস্ব পিরামিডাকার বিমান আছে এবং সেই বিমানটি একটি গম্বুজাকার স্তূপিক

এবং কারুকার্য মণ্ডিত সূক্ষ্ম অগ্রভাগ দ্বারা সম্পূর্ণ। পূর্বদিকের সমুদ্রের মুখোমুখি মন্দিরটি আয়তনে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। দুইটি মন্দিরের মধ্যে এই শিব মন্দিরটিই প্রধান। পশ্চিম দিকের দ্বিতীয় মন্দিরটি বিষ্ণুর। আকারে ও প্রকারে মামল্লপুরমের তীর মন্দির চতুষ্কোণ ধর্মরাজ রথের আদলে তৈরি করা হয়েছিল বলে মনে হয়। সুউচ্চ অথচ ক্ষীণ প্রতিটি বিমান এই মন্দিরকে বিশেষ ভাবে ছন্দোময় এবং প্রাণবন্ত করেছে। শিল্পীর স্বাধীনতা অবশ্যই এই সৌন্দর্য সৃষ্টিতে আংশিক সহায়তা করেছে। কিন্তু তার দ্বারা এই সৌন্দর্যের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না। অধ্যাপক সরস্বতী বলেছেন যে, এক নতুন আকাঙ্খা এই শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁরা তাঁদের মনশ্চক্ষুতে একটি সুসমন্বিত মন্দিরের রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

তীর মন্দিরের অল্পকাল পরে রাজসিংহ পল্লব কর্তৃক নির্মিত কাঞ্চীপুরমের কৈলাসনাথ মন্দিরকে সুসমন্বিত রূপ কল্পনার প্রথম সার্থক দৃষ্টান্ত বলা যায়। রাজসিংহ এই মন্দিরের নির্মাণ কার্য আরম্ভ করেন এবং তাঁর পুত্র মহেন্দ্রবর্মণ এটি শেষ করেন। এই মন্দির সংলগ্ন সাতটি ক্ষুদ্র মন্দির সমগ্র মন্দির পরিকল্পনার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। এখানে মণ্ডপের বলিষ্ঠ স্তম্ভ এবং সিংহ মূর্তিগুলি সমগ্র পরিকল্পনার সঙ্গে বিস্ময়কর ভাবে মানিয়ে গেছে। তীর মন্দিরের বিমানের তুলনায় এই মন্দিরের বিমান অনেক বেশি সমৃদ্ধ এবং সুপরিমিত। এই মন্দিরের প্রবেশ পথ দেখে মনে হয় যে, এতে গোপুরমের সূচনা হয়েছিল। উপরের ভার বহন করার জন্য এই মন্দিরের ভিত গ্র্যানিট পাথরে তৈরি করা হয়েছিল। দুই প্রস্থ খিলানের উপর তৈরি এই মন্দিরের পিরামিড-প্রায় বিমান এবং তার উপরের গম্বুজ দেখলে একে বৌদ্ধ স্তূপ বলে মনে হয়। বহুতল যুক্ত সুউচ্চ বিমান এই মন্দিরের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং ধর্মরাজ রথের একশিলা বিমানের তুলনায় এটি নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্টতর। এই মন্দিরে প্রাচীর বেষ্টিত চত্বর, গোপুরম, স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ এবং বিমান সবই যথাস্থানে উত্তমরূপে সংস্থাপিত হওয়ায় অধ্যাপক সরস্বতী একে দ্রাবিড় স্থাপত্য শৈলীর অন্যতম প্রধান নিদর্শন বলে মনে করেন।

কাঞ্চীপুরমের বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দিরটি বিষ্ণুর। কৈলাসনাথ মন্দিরের অল্পকাল পরে রাজসিংহ এটি নির্মাণ করেন। একে পল্লব স্থাপত্যের সবচেয়ে পরিণত নিদর্শন মনে করা হয়। এই মন্দিরের বিভিন্ন অংশ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। অংশগুলি ঘনসংবদ্ধ। শিল্পীরা এখানে শুধু ঐক্য বোধের পরিচয় দেন নি, তাঁরা অকারণ বাহুল্য বর্জন করেছেন। এক কথায় এই মন্দিরে দ্রাবিড় শিল্পরীতি আরও বেশি পরিশীলিত।

পরিশেষে বলা যায় যে পল্লব রাজাগণ উপরে বর্ণিত বিভিন্ন মন্দিরের মধ্য দিয়ে যে শিল্প ঐতিহ্য স্থাপন করেন, তাঁদের পরবর্তী চোল রাজাগণ তা ধারণ

Scanned with CamScanner

এবং বহন করেছিলেন।

চোল স্থাপত্য

চোল রাজাদের সময় মন্দির স্থাপত্য দ্রাবিড় শিল্পরীতি একটি বিশিষ্ট রূপ ও উৎকর্ষ লাভ করেছিল। প্রথম দিকের চোল রাজাদের নির্মিত মন্দিরগুলি আকারে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হলেও, সেগুলি গঠনরীতির দিক থেকে সম্পূর্ণ। তাদের মধ্যে পল্লব যুগের মন্দিরগুলির প্রভাব স্পষ্ট প্রতীয়মান। পল্লব আমলের শেষ পর্বের মন্দিরগুলিতে যে রূপরীতি গড়ে উঠেছিল, চোলদের আদি পর্বের মন্দিরগুলি তা থেকে আলাদা নয়। এই মন্দিরগুলিতে ভাস্কর্য শিল্পের চরম পরিচয় পাওয়া যায়। চোল রাজাদের এই প্রাথমিক প্রয়াসের মধ্য দিয়ে পল্লব যুগের মন্দির স্থাপত্য চোল আমলের উৎকর্ষ পর্যায়ে পৌঁছেছিল।

প্রথম পর্বের চোল রাজাদের নির্মিত মন্দিরগুলির মধ্যে দুটি, শ্রীনিবাসনল্লুরের মন্দির এবং কড়ুম্বালুরের মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন প্রথম চোল সম্রাট বিজয়ালয় এবং দ্বিতীয়টি, প্রথম পরান্তক। প্রথম মন্দিরটি বৃত্তাকার এবং তাই কিছুটা অস্বাভাবিক। কিন্তু এর গর্ভগৃহ চতুষ্কোণ, চতুষ্কোণ বিমান শিখর এবং শীর্ষে স্তূপিকা, তাই পল্লব রীতিরই স্মারক। কড়ুম্বালুরের মন্দির এই পর্বের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য নিদর্শন। একটি উপাসনাস্থল এবং অলংকৃত মণ্ডপ দ্বারা গঠিত এই মন্দির সম্পূর্ণভাবে পাথরে নির্মিত। এর উচ্চতা প্রায় ৫০ ফুট। এই মন্দিরের পরিকল্পনা প্রধানত পল্লব যুগের। তবে এর অলংকরণগুলির ক্ষেত্রে পরবর্তীকালের মতো বিমানগুলির অলংকরণ পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই মন্দিরগুলির আকারে ও পরিকল্পনায় ভারসাম্যপূর্ণ পরিবর্তন চোখে পড়ে। তাছাড়া এই মন্দিরের গায়ে অলংকরণের মধ্যে পরবর্তী চোল রাজাদের আমলের বিরাট মন্দির স্থাপত্যের পূর্বাভাস দেখা যায়।

রাজরাজ চোল এবং তাঁর পুত্র রাজেন্দ্র চোল দ্রাবিড় মন্দির শিল্পের চরম কীর্তি স্থাপন করেছিলেন। গঠনের সৌন্দর্য, আভিজাত্য এবং বিশাল আকার সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন এই দুইজন চোল সম্রাট যে বিরাট মন্দির দুটি নির্মাণ করেছিলেন তাকে দ্রাবিড় ধর্ম ও শিল্পপ্রতিভার সেরা চরম নিদর্শন বলা যায়। প্রথম মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল তাঞ্জোরে। তাঞ্জোরের এই শিব মন্দির বৃহদীশ্বর অথবা রাজরাজেশ্বর মন্দির নামে পরিচিত। এর নির্মাণ কার্য ১০০৩ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হয়ে ১০১০ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়েছিল। দ্বিতীয় মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল চোলদের নতুন রাজধানী গঙ্গাইকোণ্ডচোলপুরমে।

স্থাপত্য আয়তনের জন্য তাঞ্জোরের মন্দিরকে দ্রাবিড় স্থাপত্য শিল্পের বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন বলা যায়। সমকালীন ভারতীয় মন্দিরগুলির মধ্যে এটি

বৃহত্তম এবং উচ্চতম। এই মন্দিরের বিমান, অর্ধমণ্ডপ, মহামণ্ডপ এবং আনুষঙ্গিক বৃহৎ অলিন্দ প্রভৃতি, সবই একটি প্রশস্ত (৫০০ ফুট × ২৫০ ফুট) প্রাচীর বেষ্টিত প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলি প্রথম পর্যায়ে ঠিক কোন রূপে তৈরি হয়েছিল, বলা যায় না। এই মন্দিরগুলিতে আবরণ প্রাচীর অপরিহার্য কিছু একেবারেই ছিল না, এমন নয়। তবে বাস্তবে মনে রাখতে হবে যে, এটি প্রথম স্থাপন নয়। যদি হতো প্রথম কারণ হয়ত এই যে, মন্দিরগুলি রাজপ্রাসাদের অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। উঠানের মধ্যে প্রচুর আড়ম্বর চোখে পড়ে। এই মন্দিরের পূর্ব দিকে একটি গোপুরম। মন্দির প্রাঙ্গণে অন্যান্য ক্ষুদ্রাকার মন্দিরও আছে। কিন্তু সবার উপরে মাথা তুলে আছে একটি সুবৃহৎ বিমান বা শিখর। ক্রমান্বয়ে শীর্ষ দেশে একটি মাত্র প্রস্তর খণ্ড দ্বারা নির্মিত বৃহৎ গম্বুজ আচ্ছাদিত এই বিমানের উচ্চতা ২০০ ফুট। এই মন্দির পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল এর প্রকাণ্ড বিমান। বিমানের বিভিন্ন অংশের সমতা একে একটি অপরূপ সৌন্দর্য দান করেছে। এই বিমানকে তাই যথার্থ ভারতীয় স্থাপত্যের 'কষ্টিপাথর' বলা হয়েছে। সমগ্র মন্দিরের আয়তনও কম আকর্ষণীয় নয়। পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট এর বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ে পরিকল্পনা এবং অলংকরণ পদ্ধতি নিখুঁত। এই সব গুণের জন্য ফার্গুসন, [illegible] এবং অন্যান্যদের মতে এই মন্দিরটি দ্রাবিড় শিল্পরীতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি রূপে বিবেচিত হয়।

তাঞ্জোর মন্দিরের প্রায় কুড়ি বছর পরে রাজেন্দ্র চোল গঙ্গাইকোণ্ডচোলপুরমে তাঁর সুবৃহৎ মন্দিরটি নির্মাণ করেন। একই ধরণের পরিকল্পনা নিয়ে এবং প্রায় একই উদ্দেশ্যে, দ্বিতীয় মন্দিরের বিশাল ও জটিল চরিত্র দেখে মনে হয় যে, এর দ্বারা পুত্র তাঁর পিতার গৌরবকে অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন। এই মন্দিরটি নিঃসন্দেহে রাজেন্দ্র চোলের রাজত্বকালে চোল সাম্রাজ্যের অতিশয় সমৃদ্ধির পরিচায়ক।

প্রাচীর বেষ্টিত একটি বৃহৎ প্রাঙ্গণের (৫৮০ ফুট × ১০০ ফুট) মধ্যে মন্দিরটি অবস্থিত। এর মণ্ডপের আয়তন ১৭৫ ফুট × ৯৫ ফুট। প্রকাণ্ড বিমান এবং এই মণ্ডপ একটি অলিন্দ দ্বারা যুক্ত। মণ্ডপটি অপেক্ষাকৃত নিচু। এর ছাদ প্রায় ১৫০টির বেশি সারিবদ্ধ স্তম্ভের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকে মন্তব্য করেছেন, এই মণ্ডপের মধ্যে পরবর্তী কালের সহস্রস্তম্ভ দ্রাবিড় মণ্ডপের পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

তাঞ্জোরের বিমানের তুলনায় গঙ্গাইকোণ্ডচোলপুরমের বিমানের উচ্চতা কম (১৬০ ফুট)। প্রথম বিমানের বলিষ্ঠ সরল রেখাগুলি একে একটি পুরুষোচিত গাম্ভীর্য দান করেছে, অন্যদিকে দ্বিতীয় বিমানের বক্ররেখাগুলি একে লাবণ্যময় কমনীয়তায় মণ্ডিত করেছে। অনেকে বলেছেন যে, তাঞ্জোর এবং

Scanned with CamScanner

গীতি কবিতায় যে পার্থক্য, দুইটি বিমানের পার্থক্য মোটামুটি তাই। অন্য ভাবে বলা যায় যে, একটি বিমান শক্তির প্রতীক এবং অপরটি সৌন্দর্যের। দুইটি মন্দিরেই স্থাপত্যের স্থান মুখ্য এবং অলঙ্করণের স্থান গৌণ। তবে রাজেন্দ্র চোলের মন্দির অলঙ্করণে কিছুটা অস্থিরতার পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তী কালের মন্দিরগুলিতে যে মাত্রাতিরিক্ত অলঙ্করণ চোখে পড়ে, মনে হয় এই মন্দিরে তার সম্ভাবনা নিহিত ছিল। চোল মন্দির দুইটির বিরাট আয়তন এবং সূক্ষ্ম অলঙ্করণের দিকে লক্ষ্য রেখে বলা হয়েছে যে, চোল শিল্পীরা পরিকল্পনা রচনা করতেন দৈত্যদের মত, কিন্তু তাদের নির্মাণ কার্য শেষ করতেন মণিকারদের মত।

রাজেন্দ্র চোলের পরে চোলদের সাম্রাজ্য মহিমা যেমন ক্ষুন্ন হয়েছিল, তেমন স্থাপত্য শিল্পেও তাঁরা তাঁদের পূর্ব গৌরব হারিয়েছিলেন। মন্দির নির্মাণ এই পর্বেও অব্যাহত ছিল, কিন্তু এই মন্দিরগুলি ছিল একান্তভাবে সাধারণ পর্যায়ের। একমাত্র অলঙ্কারবাহুল্য ভিন্ন তাদের অন্য কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। অন্য দিকে একটি অশুভ প্রবণতা এই পর্বে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। যে গোপুরমের কথা পূর্বে বলা হয়েছে, এই পর্বে সেগুলি ধীরে ধীরে আয়তনে, সংখ্যায় এবং জাঁকজমকে মূল মন্দিরকে আচ্ছন্ন, কখনও বা অতিক্রম করেছিল। কুম্ভকোনমের গোপুরম এ বিষয়ে একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

পল্লব ভাস্কর্য

পূর্বে বলা হয়েছে যে দক্ষিণ ভারতে ভাস্কর্য শিল্পের সূচনাও পল্লব যুগেই হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে প্রথম স্মরণীয় নাম প্রথম মহেন্দ্র বর্মণ। তাঁর সময় এই অঞ্চলে সর্বপ্রথম গুহা মন্দিরগুলি উৎকীর্ণ হয়েছিল। তাঁর পুত্র নরসিংহ বর্মণ মহামল্ল মামল্লপুরমের রথগুলি নির্মাণ করে শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন দিক নির্দেশ করেছিলেন। এই গুহা মন্দির এবং রথগুলি বিশিষ্ট ভাস্কর্য শিল্পে সমৃদ্ধ হয়েছিল। তাছাড়া উন্মুক্ত আকাশের নিচে পাহাড় কেটে কিরাতার্জুনীয় মহাকাব্যের কাহিনী রূপায়ণও এই পর্বের একটি স্মরণীয় সৃষ্টি। এই শিল্পকার্যগুলি পরবর্তী কালের দ্রাবিড় ভাস্কর্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। এই পর্বের পল্লব ভাস্কর্যে শেষ দিকের বেঙ্গি ভাস্কর্যের প্রভাব সমধিক। পল্লব ভাস্কর্যের ক্ষীণ এবং বিলম্বিত দেহ সৌষ্ঠব বেঙ্গি ভাস্কর্যের স্মারক। অধ্যাপক সরস্বতী মনে করেন যে বেঙ্গির মূর্তিগুলির তীব্র ভাবাবেগ পল্লব মূর্তিগুলিতে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। বেঙ্গির তুলনায় এই মূর্তিগুলি অধিকতর সংযত। পল্লবদের কোন কোন মূর্তিতে দাক্ষিণাত্য ভাস্কর্যের গুরুভার দেহের আভাসও পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ভৈরবকোণ্ডের রিলিফগুলির কথা মনে আসে। সুতরাং সাধারণ ভাবে না হলেও, কোন কোন ক্ষেত্রে পল্লব ভাস্কর্যের উপর

সমকালীন দাক্ষিণাত্য ভাস্কর্যের প্রভাব একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

এই পর্বের ভাস্কর্যের মধ্যে মামল্লপুরমের কিরাতার্জুনীয় কাহিনী রূপায়ণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একদা এই ভাস্কর্যকে "গঙ্গাবতরণ" অথবা "অর্জুনের প্রায়শ্চিত্ত" নামে অভিহিত করা হত। কিন্তু অধুনা মনে করা হয় যে এতে কিরাতার্জুনীয় কাহিনী রূপায়িত হয়েছে।

মামল্লপুরমে একটি পাহাড়ের সমুদ্রমুখী একদিকের সবটা জুড়ে প্রায় ৯০ ফুট লম্বা এবং ২০ ফুট উঁচু রিলিফে মহাকাব্যটির বিষয়বস্তু মহাকাব্যিক রীতিতে খোদাই করা হয়েছে। সমগ্র দৃশ্যটি যে পরিমাণ স্থান অধিকার করে আছে, তা থেকে এই ভাস্কর্য পরিকল্পনা যে কত বৃহৎ, তা বোঝা যায়। অসংখ্য মানুষের এবং জীবজন্তুর পূর্ণাবয়ব মূর্তি এতে স্থান পেয়েছে। শুধু তাই নয়, এই মহৎ কাহিনীর রূপায়ণে তারা পরিপূর্ণভাবে অংশ গ্রহণ করেছে। কোন কৃত্রিম সীমা রেখা এই ভাস্কর্যকে আবদ্ধ করেনি। পাহাড়ের প্রান্ত পর্যন্ত এই ভাস্কর্য প্রসারিত। এখানে পাহাড়টিকে শিল্পের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে পাহাড়ের সবগুলি বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগানো হয়েছে। তার ফলে সমগ্র পাহাড়টি একটি রিলিফে পরিণত হয়েছে। মানুষ, জীবজন্তু, দেবতা, নাগদেবতা, সন্ন্যাসী, অর্ধ-দেবতা ইত্যাদির একটি সম্পূর্ণ জগৎ এই ভাস্কর্যে, পরিপূর্ণ ভাবে উপস্থিত। অনেকে একে প্রস্তর নির্মিত প্রাচীর চিত্র বলে অভিহিত করেছেন। বিভিন্ন ধরনের মূর্তি এই রিলিফে উপস্থাপিত হয়েছে, কিন্তু কোথাও ভারসাম্য ক্ষুন্ন হয়নি। এলোরার মূর্তিগুলিতে যে প্রচণ্ড কার্যকলাপ এবং অঙ্গভঙ্গির আভাস পাওয়া যায়, এই মূর্তিগুলিতে তা নেই। আগাগোড়া এক সংযমবোধ এই মূর্তিগুলিকে পৃথক-ভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে বিশেষ গৌরবে মণ্ডিত করেছে। রিলিফটি ক্রম অনুসারে এমনভাবে সাজানো, যে দেখে মনে হয় যেন মূর্তিগুলি সমতল পাহাড়ের গা থেকে অবিরাম উঠে আসছে। সমগ্রভাবে এই রিলিফে বাঁচার আনন্দ এবং উচ্ছ্বাস বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। মহাকাব্যের বিষয়বস্তু এই ভাস্কর্যের উপজীব্য হওয়া সত্ত্বেও কোন আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা তাতে স্থান পায় নি। সহজ প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবনের উচ্ছ্বসিত আনন্দরূপ সেখানে বিধৃত হয়ে আছে। মূর্তিগুলি আশ্চর্যরকম স্বাভাবিক। একথা শুধু মানুষ এবং দেবদেবীর মূর্তি সম্পর্কেই নয়, জীবজন্তুর মূর্তিগুলি সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য। পশুদের মূর্তিগুলিতে শিল্পীদের গভীর মমত্ব বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকে বলেছেন যে, তাদের সম্পর্কে গভীরতর অনুভূতির প্রকাশ সমগ্র প্রাচ্য জগতের অন্য কোন ভাস্কর্যে দেখা যায় না। পশু মূর্তির উপস্থাপনায় হাস্যরস সৃষ্টির সম্ভাবনাও শিল্পীদের দৃষ্টি এড়ায় নি। তপস্বী বিড়ালের মূর্তিটি তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

Scanned with CamScanner

মামল্লপুরমের অনুপম ভাস্কর্য ভিন্ন, প্রায় অনুরূপ শিল্পের নিদর্শন গুহা মন্দিরের কয়েকটি রিলিফে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে কৃষ্ণ মণ্ডপে পশুপালকের জীবন সংক্রান্ত দৃশ্যটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। মহিষমর্দিনী মণ্ডপে দুইটি বিপরীতধর্মী বিষয়বস্তু, যুদ্ধ ও শান্তিকে অবলম্বন করে দুইটি প্যানেল রচিত হয়েছিল। একটি প্যানেলে দেবী দুর্গা তাঁর নারীবাহিনীসহ মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধরতা। সমগ্র দৃশ্যটি তেজ ও কর্মের দ্বারা উদ্দীপ্ত। এই নাটকীয় দৃশ্যের মুখোমুখি দ্বিতীয় দৃশ্যে বিষ্ণু শেষ নাগের কুণ্ডলীর উপর অনন্ত শয্যায় শায়িত। সমগ্র দৃশ্যে এক গভীর প্রশান্তি পরিব্যাপ্ত। অন্যান্য নাটকীয় দৃশ্যের মধ্যে বরাহ মণ্ডপের দুইটি রিলিফের উল্লেখ করা যায়। একটি রিলিফে বিষ্ণু বরাহ আকারে পৃথিবীদেবীকে উদ্ধারের কার্যে নিযুক্ত। অন্যটি বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম (অর্থাৎ ত্রিপাদ গ্রহণরত) মূর্তি। দুইটি মূর্তিই প্রবল গতিবেগ সম্পন্ন।

এই প্রাণশক্তির পরিচয় মামল্লপুরমের রথগুলির রিলিফে নেই। মূর্তিগুলি সেখানে একটি ফ্রেমে আবদ্ধ এবং অনেকাংশে তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মূর্তিগুলিকে তাই জড় পদার্থ বলে মনে হয়। দোলাচল সৌন্দর্য এগুলিকে প্রাণময় করে তোলেনি। এ কথা কেবল পুরুষ মূর্তি সম্পর্কে নয়, নারীমূর্তি সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য।

উপসংহারে বলা যায় যে পল্লব ভাস্কর্যে বেঙ্গির প্রভাব থাকলেও এই প্রভাব ধীরে ধীরে কমে এসেছিল এবং এই ভাস্কর্য বেঙ্গির ইন্দ্রিয়পরায়ণতা থেকে প্রায় মুক্ত। বেঙ্গির মূর্তিগুলির শিথিল অবসাদের পরিবর্তে সংযত প্রবল শক্তি দ্বারা পল্লব মূর্তিগুলি চিহ্নিত। নারী মূর্তির তুলনায় পুরুষের মূর্তিতে, তার প্রশস্ত স্কন্ধে এই প্রাণশক্তির প্রকাশ বেশি। পোষাক ও অলংকার বিরল, ক্ষীণ কটি এবং ক্ষুদ্রবক্ষ নারীমূর্তিগুলি সাধারণ ভাবে পুরুষ-নির্ভর। দেবী মূর্তিগুলিও অনুরূপ। গভীর অথবা সূক্ষ্ম অনুভূতির কোন পরিচয় এই মূর্তিগুলিতে পাওয়া যায় না। সংযত ও সম্ভ্রান্ত এই মূর্তিগুলির মনোভাব বিশেষভাবে নৈর্ব্যক্তিক মনে হয়। সমকালীন এলোরার গুহা মূর্তিগুলিতে যে গভীর রহস্য এবং আলোছায়ার খেলা দেখা যায়, এই মূর্তিগুলিতে তা নেই। অবয়বহীন পাহাড় থেকে উদ্ভূত হলেও, এই মূর্তিগুলি খুবই স্পষ্ট। সুতরাং সমকালীন আর্যাবর্ত অথবা দাক্ষিণাত্যের ভাস্কর্য থেকে মামল্লপুরমের রিলিফের স্থান স্বতন্ত্র।

চোল ভাস্কর্য

চোলদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে, পাথরে এবং ধাতুতে, অসংখ্য মূর্তি নির্মিত হয়েছিল। এই পর্বের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য নিদর্শন মন্দির গাত্রে, গোপুরমগুলিতে,

বিস্তৃত হলঘরগুলিতে এবং মন্দির সংক্রান্ত অন্যান্য অট্টালিকায় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে করঙ্গনাথ মন্দির, তাঞ্জোর এবং গঙ্গাইকোণ্ডচোলপুরমের মন্দির, দরশুরমের ঐরাবতেশ্বর মন্দির, কুম্ভকোনমের মন্দির প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই যুগের ভাস্কর্য শিল্পীগণ চোল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন।

চোল আমলের ভাস্কর্যে পল্লব পর্বের ঐতিহ্য পবিত্রতর আকারে, দৃঢ়তর প্রত্যয়ে এবং অধিকতর জীবন্তভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। পূর্বের তুলনায় দশম শতাব্দীর মূর্তিগুলির গঠন বলিষ্ঠ, কিন্তু প্রতিমা লেপ পূর্ববৎ। দশম এবং একাদশ শতাব্দীতে মোটামুটিভাবে এই ধারা অনুসৃত হয়েছিল। এই সময় শিল্পের সূত্রগুলি বিধিবদ্ধ হয়েছিল এবং সেই সূত্র চোল আমলের ভাস্কর্যকে প্রাচীন শিল্পরীতি থেকে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনাকে প্রতিহত করেছিল। চোল আমলের প্রথম দিকের বলিষ্ঠ ভাস্কর্যে পূর্ব যুগের নমনীয়তা পুনরায় ফিরে এসেছিল। স্বেচ্ছাবৃত সংযম দ্বারা এই মূর্তিগুলির দেহভঙ্গি উদ্ভাসিত। এই মূর্তিগুলিতে কোন কিছু অর্থহীন অথবা কৃত্রিম নয়। পোষাক এবং অলঙ্কার এই মূর্তিগুলিতে দেহের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত এবং তা দেহের কমনীয়তা বৃদ্ধির সহায়ক। একাদশ শতাব্দীর শেষে অথবা দ্বাদশ শতাব্দীর শুরুতে, কোন কোন ক্ষেত্রে মূর্তি নির্মাণে কাঠিন্যের সূচনা এবং দেহের অংশবিশেষের উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার ফলে এই ভাস্কর্যের শিল্পরূপ ক্ষুণ্ণ হয়নি। প্রকৃতপক্ষে চোল ভাস্কর্য পরবর্তীকালের দক্ষিণ ভারতীয় ভাস্কর্যের আদর্শ নিরূপণ করেছিল।

চোল আমলের দক্ষিণ ভারতীয় ভাস্কর্য অপরূপ ধাতু মূর্তিগুলির জন্য অধিকতর পরিচিত। ভারতের ধাতু শিল্পে অনুরূপ মূর্তি ইতিপূর্বে কখনও তৈরি হয়নি। বাসাম বলেছেন, সমস্ত পৃথিবীতে এর তুলনা মেলে না। এদের মধ্যে যেগুলি সর্বোৎকৃষ্ট, সেগুলি আয়তনে বড়, ওজনে ভারি, সৌন্দর্য ও সরলতায় অনুপম। এই মূর্তিগুলির অনাবৃত মসৃণ শরীরে, ভারতীয় ভাস্কর্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, অলংকরণকে কখনও বাহুল্য মনে হয় না। এদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনুপাত একান্তভাবে শিল্পশাস্ত্র সম্মত। শিল্পশাস্ত্রের বিধান মেনে চলা সত্ত্বেও তামিল শিল্পীগণ কীভাবে এই মূর্তিগুলিতে সৌন্দর্য এবং ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের মিলন ঘটিয়েছিলেন, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

দক্ষিণ ভারতে তখন নানা প্রয়োজনে এই মূর্তিগুলিকে ব্যবহার করা হত। প্রথমত তাদের মন্দিরে স্থাপন করা হত। দ্বিতীয়ত, বৎসরব্যাপী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানাদিতে এই মূর্তিগুলি প্রদর্শিত হত। তৃতীয়ত, এগুলি আনুষ্ঠানিক এবং ধর্মীয় শোভাযাত্রার অংশ বলে বিবেচিত হত। এইসব কারণে এই মূর্তিগুলি এত ব্যাপকভাবে নির্মিত হয়েছিল। উপরন্তু ভক্তি থেকে উদ্ভূত এক তীব্র আধ্যাত্মিক এবং আবেগপূর্ণ আন্দোলন তখন দক্ষিণ ভারতের মানুষের মনকে

Scanned with CamScanner

অধিকার করেছিল। তাই এই মূর্তিগুলিতে আবেগ এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতিফলন ঘটেছিল।

দক্ষিণ ভারতের মূর্তি তামা অথবা পঞ্চধাতুতে (পঞ্চলোহ) তৈরি। তবে পঞ্চধাতুতে তৈরি হলেও, এই মূর্তিগুলিতে তামার পরিমাণই বেশি থাকত। অন্তত প্রথম দিকের মূর্তিগুলি সম্পর্কে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। প্রথম দিকে সীসার ব্যবহার বেশি না থাকলেও, শেষ দিকে তা বেড়েছিল। পূর্ণগর্ভ এবং শূণ্যগর্ভ, দুই ধরনের মূর্তিই তৈরি হত। তবে পূর্ণগর্ভ মূর্তিই ছিল সংখ্যায় বেশি।

দেব-দেবীর (শিব, পার্বতী, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, কৃষ্ণ এবং রাম) মূর্তিই ছিল বেশি। তাছাড়া শৈব সন্ত, বৈষ্ণব আলবার, এমন কি কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ এবং জৈন মূর্তিও নির্মিত হয়েছিল। রাজা-রাণীর মূর্তিও এই ধাতুশিল্পের অন্তর্গত ছিল। মূর্তি নির্মাণে ধর্মীয় প্রেরণা ভিন্ন হলেও, শিল্পরীতিতে কোন তারতম্য ছিল না। এই মূর্তিগুলির মধ্যে নটরাজ মূর্তি সর্বাধিক পরিচিত। চোল আমলের অপেক্ষাকৃত শেষ দিকে, একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে, এই মূর্তিগুলি নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু বিলম্বে হলেও, এই মূর্তিগুলিতে শিল্পীরা এমন এক শিল্প নিদর্শন রেখে গেছেন, বিশ্ব শিল্পের ইতিহাসে যা অতুলনীয়। সমকালীন প্রস্তর ভাস্কর্যে যে ক্লান্তির ছাপ চোখে পড়ে, এই ধাতু মূর্তিগুলি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তবে একেবারে শেষ দিকের মূর্তিগুলিতে কাঠিন্যের কিছু চিহ্ন রয়ে গেছে। গোলাকার এই মূর্তিগুলিতে শিল্পী মূর্তির সম্মুখ, পশ্চাৎ এবং পার্শ্বভাগের উপর সমান ও পূর্ণ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। এই মূর্তিগুলির পবিত্র ও মসৃণ দেহবিন্যাস, সৌষ্ঠবপূর্ণ ভাঁজ এবং সহজ নমনীয়তা তাদের স্বাভাবিকতায় ও ভারসাম্যে প্রশান্তি ও মহত্ত্বে মণ্ডিত করেছিল। অধ্যাপক সরস্বতী বলেছেন, দক্ষিণ ভারতের এই ধাতু ভাস্কর্যে গুপ্ত যুগের শিল্পাদর্শ যেন পুনরায় ফিরে এসেছিল।

চার হাত বিশিষ্ট তরুণ নটরাজ মূর্তির একটি পা দৈত্যের পিঠে স্থাপিত এবং অন্যটি, ভারতীয় নৃত্য শিল্পের পরিচিত মুদ্রায় উত্থিত। ডঃ নীহার রঞ্জন রায় বলেছেন, সারনাথের বুদ্ধের সঙ্গে এই নটরাজ মূর্তির তুলনা করা যায়। কুমারস্বামি বলেছেন, সারনাথের বুদ্ধ মূর্তি শুধু হওয়ার প্রতীক, কিন্তু নটরাজ মূর্তি, হয়ে ওঠার। এই 'হয়ে ওঠা' বলতে বোঝায় নিরন্তর পরিবর্তন, নৃত্য যার প্রতীক। আপাত দৃষ্টিতে এই পরিবর্তন অথবা নৃত্য অস্থির। কিন্তু তৎকালীন শিল্পীরা এই পরিবর্তন এবং অস্থিরতার মধ্যে অন্তর্নিহিত, অপরিবর্তনীয় শান্তি ও স্থৈর্যকে উপলব্ধি করেছিলেন এবং নটরাজ মূর্তিতে তার শিল্পরূপ দিয়েছিলেন। দুইটি পরস্পর বিরোধী ভাবের, একদিকে চঞ্চল

প্রবাহের এবং অন্যদিকে অচঞ্চল শান্তির অপূর্ব সমন্বয় এই মূর্তিতে সাধিত হয়েছিল। এই মহৎ ও কঠিন প্রতীক ব্যঞ্জনা এবং তার অন্তর্নিহিত ছন্দ ও ভারসাম্যের জন্য নটরাজ মূর্তিকে ভারতীয় শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মনে করা হয়।

শৈব এবং বৈষ্ণব সন্তগণের মূর্তি নির্মাণের প্রেরণা ছিল ভক্তি। এবং এই ভক্তি, এই মূর্তিগুলিকে এক অপরূপ মাধুর্যে মণ্ডিত করেছিল।

Scanned with CamScanner